এক্সক্লুসিভ

আয়া রেখে নিশ্চিন্ত?

গোড়াতেই গলদ!

মঞ্জরী গাঙ্গুলি

সবসময় হাসপাতালের গণ্ডি থেকে পা বাড়িয়েই রোগীকে ভাল রাখার দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। অনেক রোগে ঠিক তার পর থেকেই রোগীর যত্ন নেওয়ার জন্য আরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন শুরু হয়। কারণ এতদিন তিনি ছিলেন হাসপাতালের ভিতরে। তাঁকে নজরে রেখেছিলেন উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্যান্য চিকিৎসাকর্মীরা। ঘরে ফিরলে যে পরিবারের মানুষ বা আয়াকে রোগীর ঘাড়ে ফেলা হল, তাঁর বা তাঁদের ঠিক সেইরকম প্রশিক্ষণ আছে তো? হাসপাতালের পরেও ক্রনিক রোগে আক্রান্তদের যত্নের গুরুত্ব সামনে রেখে গত শুক্রবার একটি সচেতনতা– অভিযান ও সাংবাদিক–সম্মেলনের আয়োজন করে কেয়ার কন্টিনিউয়াম। এই অভিযানে তাদের হাকে সাড়া দিয়েছে শহরের অন্যতম হাসপাতালগুলিও। গমিল হয়েছিলেন প্রায় ৫৫ জন বিশিষ্ট নার্সিং ডিরেক্টর্স, নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট ও ডেপুটি নার্সিং সুপার। সম্মেলনটিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার তিন অধিকর্তা ডাঃ সোমা ভট্টাচার্য, ডাঃ রানা মুখার্জি ও মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য। কোয়ালিটি কনসালট্যান্ট ডাঃ অবন্তী গোপান, ডাঃ অভিজিৎ ভট্টাচার্য, টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌমিত্র দত্ত, ইন্দোরের চৈত্রম কলেজ অফ নার্সিংয়ের অধ্যক্ষ ডঃ উষা উকান্ডে। বিশিষ্ট সঞ্চালক ও অভিনেতা মীর বলেন, 'এখন নিউক্লিয়ার পরিবারের যুগে মানুষ একা। সেক্ষেত্রে এই ধরনের পরিষেবা সাপোর্ট দিতে পারে।'

ইভেন্টের থিম ছিল কেয়ার ট্রানজিশন। সংস্থার অধিকর্তা ও বিশিষ্ট কনসালট্যান্ট জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাঃ সোমা ভট্টাচার্য বুঝিয়ে বললেন, 'যখন হাসপাতাল থেকে একজন রোগী বেরিয়ে যান, তখন বাড়ি ফেরার পর তাঁদের কীভাবে যত্ন করলে বা পর্যবেক্ষণ করলে আবার তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়বেন না বা অবস্থা আর খারাপ হবে না, সচেতনতা প্রয়োজন সে সম্পর্কেই।'

সব রোগী কিন্তু হাসপাতালে রুটিন কেয়ারের জন্য ভর্তি হন না। অনেকেই হাসপাতালে আসেন কিছু জটিল সমস্যার নিরাময়ের জন্য। স্ট্রোক, ট্রান্সপ্লান্ট, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইত্যাদি সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে ক্রনিক কেয়ারটা কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরনোর পরও চালাতে হয়। সাধারণত এই ধরনের সমস্যাগুলো বয়স্কদের মধ্যেই বেশি। অ্যাকিউট কন্ডিশনের এই রোগীরা ডিসচার্জের সময়েই ভাল হয়ে যান না। সময় লাগে। ট্রানজিশন পিরিয়ডে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক দু'তিন দিনের মধ্যে অনেককেই আবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। হাসপাতালে অভিজ্ঞ হাতে যে মাত্রায় যত্নটা মেলে, বাড়িতে তা হয় না। হয়ত তাঁর পুরো দায়িত্বই আয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে বাড়ির লোক নিশ্চিন্ত হন। আর সেখানেই হয় সমস্যা। ঠিক ঠিক যত্নের অভাবে রোগীর অসুখ আবার বাড়তে পারে, এমনকি জায়গাটায় সংক্রমণও হতে পারে।

এ দেশে বয়স্কদের সংখ্যা বাড়ছে। তাই ব্যাপারটায় আলাদা করে জোর দেওয়া জরুরি। আবারও বলছি, হাসপাতাল থেকে ছুটির পর শুধু ওষুধ খাইয়ে আর আয়া রেখেই এই রোগীদের ভাল করে দেওয়া যাবে না। এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতেই তাঁদের যত্নের ভার দিতে হবে, যাঁরা হাসপাতালের মতো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই কাজ করতে পারবেন।

তা হলে আয়াদের ওপর এই নির্ভরযোগ্যতা কি পুরো ভুল নাকি তাঁদের যোগ্যতার অভাব? ডাঃ ভট্টাচার্য উত্তরে বললেন, 'আমাদের দেশে কোনও ফর্মাল ট্রেনিং প্রোগ্রামই নেই আয়াদের জন্য। কোনও স্টেট রেকগনিশন নেই, মেডিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট থেকে কোনও রেকগনিশন নেই। আয়ারা আসলে গ্লোরিফায়েড ডোমেস্টিক হেল্প। যাঁরা রান্নাবান্না করছিলেন, কাপড় ধুচ্ছিলেন, তাঁদের হঠাৎ একদিন সকালে মনে হল এই কাজে পয়সা কম, আমি এখন থেকে রোগীর একটু মল-মূত্র পরিষ্কার করলে, জামা-কাপড় পরিয়ে দিলেই আয় বেশি হবে। তাঁদেরই নাম হয়ে গেল আয়া।' এই সমস্যার সমাধানে সরকার থেকেও ব্যবস্থা নিতে হবে তিনি বলছেন। ডাঃ ভট্টাচার্য আরও বলছেন, 'ধরুন এমন হল যে, ২ মাস পড়াশোনার পর পরীক্ষা দিয়ে তবেই আয়া হওয়া যাবে। তার একটা মানপত্র থাকবে।' শুধু তাই নয়, আয়ার ওপরের স্তরের কেয়ারগিভার নার্সিং এইড-দেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

বক্তব্য পেশ করছেন অঞ্জনা সেন। সঙ্গে সংস্থার অধিকর্তা ডাঃ সোমা ভট্টাচার্য ছবি: দীপক গুপ্ত

সচেতন হতে হবে আপনাদেরও। বাড়িতে কোনও লোক রাখার সময় আগেই তাঁর কোনও সার্টিফিকেশন আছে কি না দেখতে হবে। শুধু তাই নয়। তিনি আগে কোথায়, কেমন কাজ করেছেন, এখন তাঁর কাজের মান একইরকম আছে কি না, তাও দেখা দরকার। যাঁর পর্যবেক্ষণে রোগীর পুরো যত্নের ভারটা থাকছে, তাঁর গোড়াতেই যদি গলদ থাকে, তা হলে কি সেই মানুষটার জীবনের সুরক্ষাটাই সংশয়ের মধ্যে এসে যায়।